Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.130-136
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মনোজ বসুর ছোটগল্পে ভারতের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের বিপন্নতা

সৌমেন মন্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Based on the post-independence context of India, Manoj Bose's stories deal with three types of threats : communalism, refugee problem and language crisis. In stories centered on communalism, the author shows how communal mistrust arose out of mutual misunderstandings between Hindus and Muslims at the time. Along with this, he also showed that just as they remained terrified by falsely suspecting each other as enemies, they also later extended their helping hand to the heathen at the call of duty despite their own loss. In this way, the author leaves behind communal hatred and magnifies humanity. In stories centered on the refugee problem, minority Hindus came to India in droves from East Pakistan (present-day Bangladesh) fearing conversion. Some could not adapt there and returned to their old homes. Some have rebuilt their lives on Indian soil to defend themselves. In both cases, the refugee people are finally assured of humanity. Besides, the story written by the author about the problem that arose regarding the state language in independent India reveals his deep affection for the mother tongue. All in all, people, soil and language have got equal importance in Manoj Basu's story of this episode.

Keywords: Independence, communalism, refugees, state language, humanity.

বিশ শতকের একজন শক্তিমান কথাসাহিত্যিক মনোজ বসু। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই তিনি অবিভক্ত বাংলার যশোহর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর থানার ডোঙাঘাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর সময়ে বাল্য-কৈশোর কাটিয়ে তিনের দশকে তিনি লেখক হিসেবে জীবন শুরু করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমকালে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার মধ্যেও ‘কল্লোল’-গোষ্ঠীর লেখকদের মতো পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, বিদ্বেষ, হাহাকার নিয়ে ব্যর্থ জীবনের কোন ছবি আঁকেননি তিনি। ‘কল্লোল’-এর নগরকেন্দ্রিকতা ও ভাঙন ধরা মূল্যবোধ থেকে দূরে এক স্বতন্ত্র উপলব্ধি নিয়ে বাংলা ছোটগল্পের জগতে তিনি পদসঞ্চার করেছেন। যে সব বিষয় নিয়ে তিনি গল্প লিখেছেন তার মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের বিপন্নতা তথা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও ভাষা সংকট অন্যতম। এই দিকগুলি কীভাবে মনোজ বসুর ছোটগল্পে ধরা দিয়েছে তা সম্পর্কে আমরা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করব।

হিন্দু ও মুসলমান আন্তরিকতার সাথে পাশাপাশি বাস করে এসেছে বহু কাল। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা পর্বে রাজনৈতিক নেতাদের প্ররোচনায় উভয় ধর্মের সাধারণ মানুষের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী সাম্প্রদায়িক

অবিশ্বাস অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। তাই ধর্মকেন্দ্রিক দেশভাগকে কেন্দ্র করে বিধর্মী প্রতিবেশীকেও সেদিন তারা ভয় পেয়েছিল। অথচ বিভ্রম ছাড়া তখন ভয় পাওয়ার সঙ্গত কোনো কারণ ছিল না। এই অনুভবকে মনোজ বসু ভিন্ন ধর্মের দুই শিশু চরিত্রের আশ্রয়ে 'হিন্দু-মুসলমান' গল্পে প্রকাশ করেছেন। গল্পে পরিণতবয়স্ক হিন্দু ও মুসলমানরা পরস্পরের প্রতি আতঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু নান্তু ও হাসনা নামে দুই শিশু হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই ভয় পেয়েছে। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের মধ্যে খুলনা জেলার বাটোয়ারা বিষয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতার পটভূমিতে গল্পটি রচিত। খুলনা জেলার খালবুনা গ্রামের পূর্ণচন্দ্র ও খোরশেদ গলাগলি করে পাশাপাশি বাস করেছে বহুদিন। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ লাইনের খড়্গপাতের আগে খুলনার বাটোয়ারা বিষয়ে নানারকম গুজব উঠলে গ্রামের আর সবার মতো তারাও দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। কেউ বলে খুলনা হিন্দুস্থানের হবে, কেউ বলে পাকিস্তানের। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষের মধ্যে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার আশঙ্কা জেগে ওঠে। তাই জীবনের অনিশ্চয়তায় শান্তিপ্রিয় মানুষগুলি দুই বিপক্ষ শিবিরের মতো বিভক্ত হয়ে গোপনে শলাপরামর্শ করে। উভয় পক্ষ পরস্পরের অজ্ঞাতে গভীর রাতে বাস্তুভিটা ছেড়ে খুলনার বাইরে স্বধর্মীপ্রধান জেলায় চলে যেতে মনস্থ হয়। নিজেদের ভবিষ্যৎ তারা সমর্পণ করে খুলনার ভবিষ্যতের ওপর। লক্ষণীয়, বিধর্মীকে তারা আক্রমণের কথা বলে না, শুধু ভয় পায় আক্রান্ত হওয়ার। অথচ এর সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবনা দেখা যায় তাদের শিশুদের মধ্যে। পূর্ণচন্দ্রের ছেলে নান্তু ও খোরশেদের মেয়ে হাসনা একসাথে খেলে। একদিন নান্তু হাসনাকে ডেকে চুপিচুপি জানায়, রাতে তারা গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে, ওখানে থাকলে নাকি মুসলমানে মেরে ফেলবে। অবিশ্বাসী হাসনা মানতে চায় না। সে বলে, তার আব্বার কাছে শুনেছে মুসলমান নয়, হিন্দুরা মারবে। শেষ পর্যন্ত তারা ঐক্যমতে পৌঁছয়—হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই 'দস্যু'। তাই তাদেরকে তারা কোনোদিন দেখতে চায় না, – "দেখলেই তো মেরে ফেলবে।...বাবা রে না দেখতে হয় যেন কখনো"[১] দুই অবোধ শিশুর সরল দৃষ্টিকোণের মধ্য দিয়ে এখানে সাম্প্রদায়িকতার জট যেভাবে খোলা হয়েছে তাতে স্পষ্ট যে, হিন্দু ও মুসলমান প্রকৃত অর্থে কেউই দস্যু নয়। কিন্তু ভেদবুদ্ধির বশবর্তী হয়ে পরস্পরকে তারা দস্যু ভেবে পরস্পরের কাছে দস্যু হয়ে ওঠে।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হওয়ার পরও সাম্প্রদায়িকতা থামেনি। সদ্যোজাত পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুরা নিত্যই অত্যাচারিত হতে থাকে। ধর্মহানি ও প্রাণনাশের ঘটনায় বিপন্ন হয়ে দলে দলে তারা দেশ ছাড়ে। এই প্রেক্ষাপট অবলম্বনে মনোজ বসু 'কান্নার গাড়ি' গল্পে দেশভাগ-পরবর্তী সাম্প্রদায়িকতার মর্মন্তুদ প্রভাবকে দেখিয়েছেন। গল্পে এক দল মুসলমানবেশী সন্ত্রস্ত হিন্দু নরনারীর দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার বেদনাবিধুর ছবি পাওয়া যায়। ধরা পড়ার ভয়ে কান্না চেপে তারা দেশ ত্যাগ করছিল। কিন্তু সীমান্তের কাছে এসে গাড়ি অচল হলে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় উপচে পড়া ভিড়ে মারমুখী একদল অবাঙালি ওই বাসে চড়তে চাইলে তা আরো ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে। বাসটি যেখানে থেমেছিল সেই জায়গাটির নাম সুতিগঞ্জ (সতীগঞ্জের অপভ্রংশ)। শতবর্ষ আগে সেখানকার বটগাছের তলায় স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিয়ে এক তরুণী বধূ 'সতী' হয়েছিল। এতকাল পরে সেই গাছতলায় যাত্রীরা দেখতে পায় সাম্প্রদায়িক ধর্ষণে ক্ষতবিক্ষত চেতনাহীন অর্ধনগ্ন অন্য এক সতীকে। শাস্তি যে মৃত্যুর চেয়ে কত বীভৎস হতে পারে বাসের যাত্রীরা মূক বিহ্বলতায় তা প্রত্যক্ষ করে। দাঙ্গায় নিহত ঝোপের আড়ালে থাকা আর এক মায়ের বুক থেকে ভেসে আসা শিশুর কান্নায় সেই চলমান পাষাণপ্রতিমা সম্বিত ফিরে পায়। জীবন্ত শিশুকে সে বুকে তুলে নেয়। তার অশ্রুভরা হাহাকারে আকাশ বিদীর্ণ হয়। সাম্প্রদায়িক হিংসার এই চূড়ান্ত নির্মমতায় "আকাশের উপরে ঈশ্বর যদি থাকেন, কান্না শুনে থরথর করে নিশ্চয় তিনি কাঁপছিলেন।"[২] বাসের মেয়েরা

ত্বরিতে কাপড় দিয়ে তার লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করে। অবাঙালি লোকগুলি এই দৃশ্যে নির্বাক হয়ে বাস ছেড়ে নেমে চলে যায়। পেট্রাপোল সীমান্তে বাস পৌঁছলে ছদ্মবেশী নরনারীদের কান্নার সমুদ্র আর বাঁধ মানে না, – "কামরা বোঝাই করে কান্না বয়ে আনে, কান্নার গাড়ি সেই জন্যে নাম।"[৩] গল্পের অন্তিমে দেখা যায়, গভীর রাতে গল্পকথক অনুভব করছেন সতেরো বছর আগে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেওয়া বিপ্লবী জগতের আত্মিক অনুতাপ। আসলে তা লেখকেরই দীর্ঘশ্বাস।

সাম্প্রদায়িকতা মানুষের সহজাত স্বভাব নয়। তা রাজনৈতিক সিদ্ধিলাভের জন্য নেতাদের দ্বারা সাধারণ মানুষের ওপর আরোপিত। তাই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি মানুষের ওপর সাময়িক জয় পেলেও শেষ পর্যন্ত মনুষ্যত্বই জয়ী হয়। ক্ষমা ও ভালবাসায় সব ভেদাভেদ মুছে দিয়ে নিজেকে তা অসীমের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে। 'সীমান্ত' গল্পে লেখকের এই ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। এই গল্পে ইসমাইল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের শিকার হয়েও সাম্প্রদায়িক মানসিতাকে স্বীকার করেনি। দাঙ্গা ও দেশভাগের কালপর্বে মানুষ যখন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি অনাস্থায় প্রতিশোধের জন্য অপেক্ষমান, সেই পটভূমিতে গল্পটি রচিত। হিন্দু যুবতী মঞ্জুলার বাবা দাঙ্গার সময় থেকে নিরুদ্দেশ। শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে বিধবা মঞ্জুলা বাপের বাড়ির গ্রামে এসে তাই ইসমাইলের বাড়িতে ওঠে। বৃদ্ধ ইসমাইলের সাথে তার স্নেহের সম্পর্ক, আশৈশব তাকে সে দাদু বলে জানে। সন্তানহারা ক্ষতচিত্ত ইসমাইলের মনের অবস্থা তখন ভালো ছিল না। তাই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মঞ্জুলার প্রতি তাকে মাঝে মধ্যে বিরূপ হয়ে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু রূঢ় আচরণ, কটুকথা কোনো কিছুতে মঞ্জুলা বিচলিত হয় না। তার এক গোঁ—বিদেশ-বিভূঁয়ে সে ভিখারি উদ্বাস্তু হতে পারবে না, এত কাল যে কামরান বড়দি ও ইসমাইল দাদুর কাছে আদর-আবদারে কাটিয়েছে তাদের সাথে সে নিজের দেশে থাকতে চায়। কিন্তু হিন্দু বিধবাকে নিয়ে সমাজে নানা আপত্তি ওঠে। রফিক মিয়া কলমা পড়িয়ে নিকা করে মঞ্জুলার ধর্মনাশ করার পরিকল্পনা করে। কামরন তখন মঞ্জুলাকে এক প্রকার জোর করে সীমান্তস্টেশনে পাঠিয়ে দেয়। ট্রেনে চড়ে কলকাতা শহরের উদ্দেশে অশ্রুচোখে পাড়ি দেওয়ার পথে ইসমাইল দাদুর দিয়ে যাওয়া পিঠের হাঁড়ি খুলে মঞ্জুলা দেখে পোড়া পিঠে আর তিলের নাড়ুর নিচে চিকচিক করছে সোনার মোহর। জীবনসঞ্চিত এই মোহররাশি ইসমাইল রেখেছিল হিন্দুর হাতে নিহত সন্তানের নামে দিঘি কাটাবে বলে। কিন্তু অচেনা শহরে নির্বান্ধব জীবনে যাতে মঞ্জুলার কষ্ট না হয় সেই কথা ভেবে সে তা উজাড় করে দিয়েছে অকাতরে। সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে মনুষ্যত্বের সীমা প্রসারে 'সীমান্ত' একটি অতুলনীয় গল্প হয়ে উঠেছে।

দাঙ্গা শেষ হওয়ার পর পরিবেশ স্থিতিশীল হলে মানুষের স্নেহ-মায়াপূর্ণ পরিচিত মানবিক রূপ পুনরায় বেরিয়ে আসে, আবার আগের মতো সম্পর্কের টান গড়ে ওঠে। 'এপার ওপার' গল্পে লেখক বিপন্ন সময়কে অতিক্রম করে মানুষের সঙ্গে মানুষের চিরন্তন সম্পর্কের সেই মধুর রূপকে দেখিয়েছেন। ১৯৪৬-এ রাজনৈতিক প্ররোচনায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হয় হিংসা-প্রতিহিংসার অন্ধ আক্রোশে সেই দাঙ্গা সংক্রমণের রূপ পেলে বিহারের দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া সেদিন আছড়ে পড়ে পূর্ববঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে। নির্বিচারে তখন লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। হিমাংশু ও তার পরিবার এই দাঙ্গায় চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মারাত্মকভাবে জখম হয়ে হিমাংশু কোনক্রমে বাঁচলেও তার স্ত্রীর জীবনরক্ষা হয়নি। দেশভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিবারকে হারিয়ে হিমাংশু পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে ভারতে এসে বসবাস শুরু করে। শৈশবের চেনা বন্ধুদের যে অচেনা রূপ সে দেখে এসেছিল তাতে আর সেখানে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না তার। কিন্তু অর্থকষ্টে পড়ে ফেলে আসা বাস্তুভিটা ও জমিজমা বিক্রি করতে চার বছর পরে

জন্মভূমিতে ফিরে এসে সে দেখে, – "ঝড়-ঝাপটার পর প্রসন্ন রোদ উঠেছে, চিরকালের স্বভাব ফিরে পেয়েছে আবার মানুষ। ভালবাসার এমন প্রস্রবণ লুকানো ছিল লোকের হৃদয়ে হৃদয়ে!"[৪] জন্মভূমির অজস্র মুসলমান নর-নারী আদর-আপ্যায়নে হিমাংশুকে অস্থির করে তোলে, তাকে ঘিরে গ্রামে উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়। তাই হিমাংশু অর্থের প্রয়োজনে পাকিস্তানে এলেও সেই টাকা আর নিয়ে যেতে পারে না। অশ্রু-সজল বিদায়মুহূর্তে জমি বিক্রির সমস্ত টাকা সে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে যায়। ভালোবাসার উষ্ণ প্রস্রবনে সাম্প্রদায়িকতার গন্ডীরেখা এখানে পুরোপুরি মুছে গেছে।

দ্বিজাতিতত্ত্বের নিরিখে ভারতের খণ্ডাংশ দিয়ে মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান নামে পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হলে সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের ভয়ে সংখ্যালঘু হিন্দুরা সেখান থেকে দলে দলে ভারতে আসতে থাকে। কিন্তু উদ্বাস্তু মানুষের ভিড়ে ভারতে তখন এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয় যে সেখানে বসবাস করাও কঠিন হয়ে ওঠে। ফলে কেউ কেউ ফিরে আসে জন্মভূমির পুরানো ঠিকানায়। দেশত্যাগ ও প্রত্যাবর্তনের এই ঘটনা অবলম্বনে মানুষের তৎকালীন নিরুপায় পরিস্থিতিকে মনোজ বসু 'তাঁতের মাকু' গল্পে দেখিয়েছেন। গল্পের কথক দেশভাগের পর আশার ছলনায় ভুলে সপরিবারে দেশত্যাগ করে আশাহত হয়ে পুনরায় স্বদেশে ফিরে এসেছেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পর সিঁদচুরি ও মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু বিধবার স্বেচ্ছাপ্রণয়ের মতো সাধারণ ঘটনাও সংখ্যালঘু হিন্দুদের কাছে মুসলমানের ষড়যন্ত্র বলে মনে হয়। ফলে মুখে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দেওয়া তা-বড় তা-বড় নেতারা যেমন দেশছাড়া হয়, তেমনি দেশছাড়া হবে না বলেও সাধারণ মানুষ রাতের অন্ধকারে ওপারের উদ্দেশে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়। এই রকম পরিস্থিতিতে গল্পকথকও একরাতে স্ত্রী-সন্তানসহ ওপারগামী ট্রেনে মানুষের পাশবিক ভিড়ে মিশে চূড়ান্ত হয়রানি ও দুর্ভোগ পেরিয়ে কলকাতায় মামার বাড়ী পৌঁছন। শীতল অভ্যর্থনা ও থিকথিক লোকারণ্যের মাঝে কোনমতে স্থান সংকুলান করতে হয় তাঁদের। এই চরম প্রতিকূলতার মধ্যে গল্পকথক হ্যালুসিনেশনে পৌঁছে যান শৈশব-কৈশোরের স্বপ্নে ঘেরা দেশের মাটি আর মানুষের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। একসময় জানা যায় মামা-মামিও নিরুপায়, আশ্রিতদের খাবার জোগাড় করতে তাদের নিজেদেরই একবেলা উপোস করতে হয়। কোথাও কিছু ব্যবস্থা করতে না পেরে দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। পথে বিসর্জন দিয়ে আসতে হয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিউমোনিয়ায় মারা যাওয়া তাদের শিশু সন্তানটিকে। তাঁতের মাকুর মতো তাঁরা এদিকের ধাক্কায় ওদিকে গিয়েছিলেন, এবার ওদিকের ধাক্কায় ফিরে এসেছেন এদিকে। তবু অবিশ্বাসের থেকে আশ্বাসই বড় হয়ে ওঠে শেষ পর্যন্ত, যখন দেখি কথকের আশৈশব পরিচিত সবেদ শেখ গোরুর গাড়িতে করে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে বলে, – "আমরা সকলে তো আছি ছোটবাবু।"[৫]

দেশভাগ পূর্ব-পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সংখ্যালঘু হিন্দুদের জীবনে ছন্দপতন ঘটায়। জাতিনাশের আশঙ্কায় তাদের কিছু মানুষ বাস্তু ত্যাগ করে ভারতে চলে আসে। আর কিছু মানুষ নাড়ির টান কাটাতে না পেরে সেখানেই থেকে যায়। উভয়ের সম্পর্কের মেলবন্ধনে দেশভাগের পূর্বে জীবনের যে উচ্চকিত প্রকাশ ছিল দেশভাগের পরে তা খাঁ-খাঁ শূন্যতায় হারিয়ে যায়। জীবনের এই পূর্ণতা ও শূন্যতার প্রেক্ষাপটে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া মানুষের অপরাধবোধকে লেখক 'বিয়েবাড়ি' গল্পে মানবিক আবেদনে উত্তীর্ণ করেছেন। এই গল্পে বিয়েবাড়ির জনসমাগম ও আনন্দোল্লাস দেশভাগের পর পোড়োবাড়ির নির্জনতায় হারিয়ে গেছে। গল্পের প্রথমাংশে বিস্তৃত পরিসরে দেখা যায় স্বচ্ছল একান্নবর্তী এক পরিবারের বিয়েবাড়ির দৃশ্য। কনে দেখা থেকে শুরু করে সেখানে আত্মীয়কুটুম্বদের রঙ্গ-তামাশা, দশকর্ম, খাওয়া-দাওয়া, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, নাড়ু কোটা, শিশুদের খেলাধূলা, পাড়াপড়শির উদ্যোগ-আয়োজন, কুলীন

বরযাত্রীদের দক্ষিণা ও দাবি, বরপক্ষের গয়না যাচাই, আইবুড়ো ভাতের ঘটা, কনের স্নানপর্বে গৃহস্থবাড়ির আশীর্বাদী জল আনা, স্ত্রী-আচারসহ দোর্দণ্ডপ্রতাপ গৃহকর্ত্রী পিসিমার দিনরাত্রি তদারকি—এসব কিছুর মধ্য দিয়ে গ্রাম-বাংলার গৃহস্থ জীবনের নিটোল আনন্দময়তার পরিপূর্ণ প্রকাশ লক্ষ করা যায়। বাড়ির সকলে মায়ারানীর সাথে স্বগ্রামনিবাসী রঘুর ছেলের বিয়ে দেওয়ায় ইচ্ছুক থাকলেও ছাত্রাবস্থায় সেই ছেলে বিয়েতে রাজি হতে পারেনি। মায়ারানীর তাই অন্যত্র বিয়ে হয়। বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর বিদায়ের পূর্বক্ষণে মায়ারানীর ছেলেমানুষি তর্জনে ছেলেটির বিষণ্ণতায় তাই প্রকাশ পায় এক অস্ফুট রোমান্স। সব মিলিয়ে তৈরি হয় বিয়েবাড়ির হৃদয়ঘন এক পূর্ণাঙ্গ ঝলমলে ছবি। হঠাৎ অতীত থেকে বর্তমানের দিকে দৃশ্যপট পরিবর্তিত হলে দেখা যায় পোড়োবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জনৈক ভদ্রলোক সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করছেন, – "সানাই বাজে শুনতে পাচ্ছ—সাদেক আলি?"[৬] কোন বিস্মৃত অতীতে এতক্ষণ যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ফেলে আসা কাল আর বর্তমানের মাঝ দিয়ে ইতিমধ্যে বয়ে গেছে অনেকটা সময়, ঘটেছে দেশভাগের মতো গুরুতর ঘটনা। ছেড়ে আসা গ্রামকে হিন্দুস্থান থেকে দেখতে এসে মায়ারানীর পৈত্রিক ভিটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। একদিন যে বাড়ি ছিল আনন্দ-কোলাহলে প্রাণবন্ত, সেই বাড়ি আজ শ্মশানের মতো স্তব্ধ। কলতান মুখরিত আনন্দোচ্ছল বিয়েবাড়ির স্মৃতির বিপরীতে সেই একই বাড়ির নির্জন বিষণ্ণ এই রিক্ততা দেশভাগ-পরবর্তী সময়ের শূন্যতাকে তুলে ধরে। এরপর লেখক সেই শূন্যতায় বেঁচে থাকা মানুষগুলিকে উপস্থিত করেছেন। দেখা যায়, ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে আসেন সেকালের সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ পিসিমা দৈবসুন্দরী দাসী। বার্ধক্যে আজ তাঁর দেহ নুয়ে পড়েছে। আর্থিক সামর্থ্যও আর কিছু অবশিষ্ট নেই। কাছের মানুষগুলি হিন্দুস্থানে চলে গেলেও 'ভিটেয় পিদদিম দেওয়ার জন্য' তিনি রয়ে গেছেন। তাঁর সাথে আশাহীন নিরুদ্যম জীবন অতিবাহন করে অকালবিধবা মায়ারানী। ভদ্রলোককে দেখে পিসিমা 'রঘুর ছেলে' বলে চিনতে পারলে স্বার্থপরতার অপরাধবোধে আগন্তুক পীড়িত হন। তাই প্রকৃত পরিচয়কে গোপন রেখে তিনি 'নতুন লোক' বলে নিজের পরিচয় দেন। বিবাহ সূত্রে যাঁদের সাথে কত গভীর সম্পর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাঁদের সাথে অপরিচয়ের ভান করার মধ্যে যে বেদনা লুকিয়ে থাকে লেখক তাকে এই ভাবে প্রকাশ করেছেন। দেশভাগের পর চিরপরিচিতরাও বিদেশি হয়ে ওঠে। তখন তাদের সাথে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কটা আর আগের মতো সহজ থাকে না। তাই দেখা যায়, পোড়োবাড়ির ইঁটের পাঁজা কেনার অজুহাতে আগন্তুক ভদ্রলোক বায়না স্বরূপ কিছু টাকা দিতে চেয়েও পারেন না। কারণ টাকাটা হিন্দুস্থানের—এ টাকা দিলে বা নিলে উভয় পক্ষেরই আইনগত বিপদের আশঙ্কা তৈরি হবে। দেশভাগ উপলক্ষ্যে সম্পর্কের দূরত্বে মানুষ কীভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল এই গল্প তার সাথে আমাদের পরিচয় করায়।

দেশভাগের পর পাকিস্তান থেকে আশঙ্কিত সংখ্যালঘু হিন্দুরা ভারতে এসে বসতি স্থাপন করে। বসতি স্থাপন করতে শুধু তারাই আসেনি, সঙ্গে এসেছিল তাদের পুরনো স্মৃতি ও সম্পর্কগুলো। কিন্তু কেবল অতীতকে আঁকড়ে পড়ে থাকলে জীবন থমকে যায়। তাই বহমান বর্তমানে পরিপূর্ণভাবে বাঁচতে হলে সেই সব পুরনো সম্পর্ক ও স্মৃতির ভিড় সরিয়ে নতুন স্বপ্নে জীবন গঠনের সংকল্প নেওয়া যে উচিৎ লেখক তা 'ধুনোবাণ-সর্ষেবাণ' গল্পে দেখিয়েছেন। এই গল্পে টুনি-পরেশের মতো ছিন্নমূল মানুষগুলি নিজেদের পূর্বতন জীবনের সংস্কারকে ত্যাগ করে নতুন মাটিতে পুনর্বাসিত হতে চেয়েছে। অলৌকিক বিশ্বাস অনুসারে ধুনোবাণ-সর্ষেবাণ হল 'ভূত' তাড়ানোর মন্ত্রঃপূত উপকরণ বিশেষ। আসামের হাইলাকান্দির এক উদ্বাস্তু বধূর ওপর ছেড়ে আসা পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে আসা তার মায়ের ভূত ভর করে। ওঝা এসে

ধুনোবাণ সর্ষেবাণের মন্ত্রে বধূকে ভূতমুক্ত করে ভূতকেও পুনর্বাসন দেয়, – "শ্মশানঘাটার মাঠে আরো দশ-বিশটা রয়েছে তো—সেইখানে যা, স্বজাতির সঙ্গে থাকবি ভাল।"[৭] এই ভূত আসলে ছেড়ে আসা মাতৃভূমির পূর্বতন সংস্কার। অন্যদিকে সীমান্তপারে টুনি-পরেশের মধ্যে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের যে দূরত্ব ছিল, হাইলাকান্দি গ্রামে একসাথে ঘর বেঁধে 'ভূত'(অতীত)-জীবনের সেই সম্পর্ককে ভুলে তারাও নতুন মাটিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। অতীতের পিছুটান ছিন্ন করতে নবজীবনের স্বপ্ন তাদের কাছে হয়ে ওঠে 'ধুনোবাণ-সর্ষেবাণ'। ভূত তাড়ানোর প্রতীকে উদ্বাস্তুদের জীবনসংকল্প সার্থকভাবে প্রতিভাসিত হয়েছে এই গল্পে।

ভারত এক সুবৃহৎ দেশ। এখানে বহু ভাষাভাষীর মানুষ বাস করে। তাই কোনো একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হলে দেশের অধিকাংশ মানুষের তাতে অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। তাই বর্তমানে ২২টি ভাষা সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত থাকলেও ভারতের কোনো রাষ্ট্রভাষা নেই। কিন্তু দেশভাগের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে হিন্দিকে সবার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। ফলে অন্য ভাষাভাষীরা সেদিন নিজেদের বঞ্চিত মনে করেছিল। সেই বঞ্চনার বেদনাকে লেখক 'আ মরি বাংলা ভাষা!' গল্পে প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য গল্পে মাতৃভাষার বিপন্নতায় ভাষা-সাধক শ্রীকণ্ঠ বেদনা বোধ করেছেন। স্বাধীনতার পর ভারতের রাষ্ট্রভাষা হয় হিন্দি এবং পাকিস্তানের উর্দু। উভয় দেশের বিদ্যালয়গুলিতে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম। মাতৃভাষার অবহেলায় বাঙালি তাই সেদিন মর্মে ব্যথিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই দুর্দিনে আজীবন ভাষা-সাধক শ্রীকণ্ঠ আগামী দিনের কথা ভেবে হতাশা বোধ করেন, – "ভবিষ্যতের ভাষাতাত্ত্বিক পুরানো পুঁথিশালা খুঁজে বের করবেন, বাংলা নামক এক বিলুপ্ত ভাষার দুষ্প্রাপ্য নিদর্শন।"[৮] তবু বিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়ার মুহূর্তে বাংলা-শিক্ষক শ্রীকণ্ঠ আশা পোষণ করেন, – "আপোষেই হার মেনে নিচ্ছি কেন? বাংলাভাষার অতুল শক্তি-সমৃদ্ধিতে দখল করে ফেলব রাষ্ট্রভাষা।"[৯] মাতৃভাষার প্রতি এই ভাবনায় আবেগ থাকলেও তা যুক্তিসিদ্ধ। মনোজ বসু চাইতেন, স্বাধীন ভারতের প্রতিটি রাজ্য স্বভাষাকে সুন্দর বলিষ্ঠ ও সর্বপ্রকাশক্ষম করে তুলুক এবং সংবিধানের তফসিলভুক্ত প্রতিটি ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পরিগণিত হওয়ার মধ্য দিয়ে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হোক। তিনি মনে করতেন, –

> "শিশুরা মাতৃভাষায় পাঠ নেবে এবং সর্বসাধারণ ঐ ভাষার মাধ্যমে কাজকর্ম চালাবে। কেবলমাত্র সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংযোগের ভাষার ব্যবহার, অপর তাবৎ ক্ষেত্রে মাতৃভাষা। আজকের পৃথিবীতে ইংরেজি হল আন্তর্জাতিক বাতায়ন। ইংরেজি হঠিয়ে সেই বাতায়ন বন্ধ করা আত্মহত্যারই নামান্তর। এমন ভ্রান্ত জাতীয়তার মানে হয় না—তাছাড়া ইংরেজিও একরকম স্বভাষা হয়ে গেছে আমাদের। অতএব সংযোগের ভাষা হিসেবে ইংরেজি যেমন আছে, থাকুক। অনাবশ্যক কেন বোঝা বাড়াতে যাব?"[১০]

হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে লেখক কেন মেনে নেননি সেই সুচিন্তিত মতামতের পাশাপাশি মাতৃভাষার প্রতি তাঁর সদর্থক মূল্যবোধও এখানে স্পষ্ট হয়েছে। আলোচিত গল্পটি এই বোধেরই অপরূপ প্রকাশ।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ করলাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও ভাষা সংকটকে কেন্দ্র করে মনোজ বসু ভারতের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের বিপন্নতাকে কীভাবে তাঁর গল্পে রূপ দিয়েছেন। আলোচিত গল্পগুলিতে প্রাপ্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূলে বিদ্বেষ নেই, রয়েছে বিভ্রম তথা অবিশ্বাস। এই অবিশ্বাসের সূত্র ধরে দাঙ্গাকে এড়াতে 'হিন্দু-মুসলমান' গল্পের পূর্ণচন্দ্র-খোরশেদরা জন্মভিটা ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছে। অন্যদিকে 'কান্নার গাড়ি' ও 'সীমান্ত' গল্পের মানুষেরা চলে যাওয়ার আগেই দাঙ্গার শিকার

হয়েছে। তবু প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে মানুষ যখন অমানুষ হয়ে উঠতে উদ্যত, তখন সেই চরম মুহূর্তে 'সীমান্ত' গল্পের ইসমাইল চরিত্রে মনুষ্যত্বের অদ্ভুত প্রকাশ পাঠককে বিস্মিত করে। দাঙ্গার স্মৃতিতে ভীত মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে, কখনো বা পুনরায় স্বভূমিতে ফিরে এসেছে। 'তাঁতের মাকু' ও 'ধুনোবাণ-সর্ষেবাণ' গল্পে তাদের প্রতি স্থিতিশীল জীবনের আশ্বাস উচ্চারিত হয়েছে লেখকের কলমে। দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও মানুষের নিজ-বাসার মতো তার ভাষা নিয়েও যে মনোজ বসু কতখানি ভাবিত ছিলেন তার পরিচয় পেয়েছি 'আ মরি বাংলা ভাষা!' গল্পে। সব মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, শুধু বিপন্ন সময়ের ছবি আঁকা নয়, সেই সংকট থেকে উত্তরণে তাঁর গল্পগুলি সমকালকে প্রভূত প্রেরণাও দিয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

1) ভূদেব চৌধুরী সম্পাদিত, মনোজ বসুর গল্প সমগ্র (উত্তর পর্ব), বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ মার্চ ২০১৫, পৃষ্ঠা ৫৪।
2) তদেব, পৃষ্ঠা ১৪৬।
3) পৃষ্ঠা ১৪৬।
4) পৃষ্ঠা ৪৩২।
5) মনোজ বসু, দিল্লি অনেক দূর, বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১ বৈশাখ ১৩৫৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৯৩।
6) মনোজ বসু, মায়াকন্যা, গ্রন্থপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৩১।
7) তদেব, পৃষ্ঠা ৪০০।
8) পৃষ্ঠা ১০৪।
9) পৃষ্ঠা ১০৬।
10) মনোজ বসু, ঝিলমিল, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ৯ শ্রাবণ ১৩৬৭, পৃষ্ঠা ১৪১।